প্রথম আলো

# খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না: প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বিতর্ক

চৌধুরী মুফাদ আহমদ

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ১০:৪০
আপডেট: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ১১:০০

ফাইল ছবি

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা উচিত কি না, সে নিয়ে বিতর্ক আছে। জাতীয়

শিক্ষানীতিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু শিক্ষানীতি তৈরির অনেক বছর পার হলেও এখনো প্রাথমিক শিক্ষা আগের মতোই মাত্র পাঁচটি বছরে সীমিত আছে! এ নিয়ে কারও কারও মধ্যে বেশ হতাশার ভাবও লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বা ছয় বছর। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গঠিত কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার সুপারিশ ছিল। খুদা কমিশনের প্রতিবেদন থেকেই বিষয়টি ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এসেছে।

৪৪ বছর আগে কিছু দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা বাদে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য নিজের গ্রামে বা পাশের গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। তবে খুব বেশি শিশু পাঠশালার পথ মাড়াত না। যারা যেত, তাদেরও বেশির ভাগই এক-দুই কেলাস পড়ার পর বাজানের সঙ্গে মাঠে লাঙল বাইতে যাওয়ার ডাক পেত। সামান্য যে কজন কষ্টেশিষ্টে পাঠশালার শেষ ধাপ ডিঙোত, তাদের অনেকেরই লেখাপড়ার পাঠ সেখানেই সাঙ্গ হতো। কারণ, দেশে তখন মাধ্যমিক স্কুল হাতে গোনা। গ্রামের পাঠশালা পাস করে আরও বড় ক্লাসে পড়তে হলে দূরে থানা বা মহকুমা শহরে যেতে হতো। কে পাঠায় তার বাচ্চা ছেলেকে এত দূরে? সঙ্গে আছে খরচের ধাক্কা। আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই। এ সময় পাঠশালায় আরও তিন ক্লাস পড়ার সুযোগ থাকলে পঞ্চম শ্রেণি ডিঙানো শিশুরা স্বচ্ছন্দে বাকি তিনটি শ্রেণিও ডিঙিয়ে যেত। তাই কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ তিন বছর বাড়ানোর সুপারিশ করার যুক্তি ছিল।

দুই.

কুদরত-ই-খুদা কমিশনের পর অনেক সময় পার হয়ে গেছে। গত চার দশকে শুধু বাংলাদেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থার বিপুল সম্প্রসারণ ঘটেছে। নিম্ন ও নিম্নমধ্য আয়ের দেশগুলোয় দলে দলে শিশুরা স্কুলমুখী হয়েছে, স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পরিবর্তন হয়েছে যুগান্তকারী। বর্তমানে দেশের ছয় বছর বয়সের শতকরা ৯৭টি শিশু প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে (জেন্ডার প্যারিটি ইনডেক্স ১.০২)। যারা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তাদের শতকরা ৮১ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে। এখন দেশে নানা কিসিমের প্রাইমারি স্কুল আছে ১ লাখ ৩৩ হাজার।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ছয় হাজারের কম। আজ এই সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়েছে। পাহাড়, চর, হাওরের মতো দুর্গম এলাকা বাদ দিলে দেশের অধিকাংশ এলাকায় দু-চার কিলোমিটারের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল আছে। অনেক এলাকায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি স্কুল হয়েছে। এখন যারা প্রাইমারি পাস করে, তাদের শতকরা ৯৬ জনই আশপাশে মাধ্যমিক স্কুলের

ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে আবার সংখ্যানুপাতে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। তাই মাধ্যমিক স্কুল নেই–এই যুক্তিতে পাঠশালায় আরও তিন ক্লাস খোলার এখন আর প্রয়োজন নেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা মূলত ভাষা ও গণিতের ওপর মৌলিক ধারণা পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধাপে ধাপে নানা বিষয় পড়ানো শুরু হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। কারণ, ভাষা শেখানো ও ভূগোল শেখানোর তরিকা এক নয়। প্রাথমিকের শিক্ষকের জন্য শিশু-শিক্ষণ তত্ত্ব ও কৌশল জানা জরুরি। মাধ্যমিকের শিক্ষকের জন্য জরুরি আকর্ষণীয়ভাবে ধাপে ধাপে নানা বিষয় উপস্থাপনের কৌশল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমেও থাকে মৌলিক কিছু পার্থক্য।
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য এখন সম্পূর্ণ পৃথক প্রশাসন, পৃথক মন্ত্রণালয়। এখন প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার তিন বছর অন্তর্ভুক্ত হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ও সামগ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের খোলনলচে পাল্টাতে হতে পারে। এতে লেজে-গোবরে অবস্থা হওয়ারও ভয় আছে। বিপুল অর্থ-শ্রাদ্ধের কথা বলাই বাহুল্য।

ইউনেসকো প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক এই তিনভাগে ভাগ করে এবং সে অনুযায়ী সব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। আমরা প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিককে একীভূত করে প্রাথমিক নাম দিলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদনে হযবরল অবস্থা সৃষ্টি হবে।
আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের কেন প্রয়োজন? এই প্রশ্ন আমি অনেককে করেছি। জবাব একটাই–শিক্ষানীতিতে এমনই বলা আছে যে! কিন্তু এর সুফল কী, কিংবা পাঁচ বছরের প্রাইমারিতে অসুবিধা কী, তা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। কোনো পলিসি বা নীতিই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। নানা কারণে শিক্ষানীতিসহ বাংলাদেশের আরও অনেক নীতির অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা না হওয়ার বিষয়টি বারবার আলোচনায় ফিরে আসে।

তিন.
তবে কি আমদের ছেলেমেয়েদের কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস করার যে প্রয়োজন ১৯৭৪ সালে ছিল, তা এখন নেই? মোটেই তা নয়। সে প্রয়োজন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক গুণ বেশি। কিন্তু তার জন্য প্রাইমারির মেয়াদ না বাড়িয়ে নজর দিতে হবে অন্যত্র।

বাংলাদেশের গত চার শতকে স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি বাড়ার এবং প্রাইমারিতে পাস করা শিশুদের দলে দলে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার

অর্থ এই নয় যে তাদের সবাই মাধ্যমিক শিক্ষা বা অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত কমে এলেও এখনো ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ৩০ জন অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার বৈতরণি পার হয় না। মোট হিসাবে বাংলাদেশের ছয় বছর বয়সী ১০০টির শিশুর মধ্যে মধ্যে মাত্র ৪৫ জন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে। বিপুল সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীর স্কুলে নিয়ে আসার সাফল্যের প্রেক্ষাপটে এই হিসাব উদ্বেগজনক বৈকি।

চার.

উদ্বেগের আরও কারণ আছে। শিশুদের যখন স্কুলমুখী করা যেত না, তখন মনে করা হতো স্কুলে গেলেই শিশুরা শিখবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সমীকরণটি এত সহজ নয়। শিশুরা স্কুলে আসছে, কিন্তু যা শেখার তা শিখছে না। ইউনেসকোর এক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের সাড়ে বারো কোটি শিশু কমপক্ষে চার বছর স্কুলে যাওয়ার পরও প্রয়োজনীয় ভাষাগত বা গাণিতিক জ্ঞান অর্জন করে না।

বিশ্বব্যাংকের এ বছরের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আফ্রিকার দেশ মালাওয়ি ও জিম্বাবুয়ের শতকরা ৮৯ জন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণি শেষ করার পর একটিও শব্দ পড়তে পারে না; ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় শতকরা ২৭টি ও জাম্বিয়ায় শতকরা ৪৪টি শিশু কার্যত নিরক্ষর থাকে; গ্রামীণ ভারতে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীর অর্ধেকই তাদের স্থানীয় ভাষায় লেখা দ্বিতীয় শ্রেণির বই ভালোভাবে পড়তে পারে না; পাকিস্তানের শহর এলাকার ৫ মধ্যে ২ জন এবং গ্রাম এলাকায় ৫ জনের মধ্যে ৩ জন শিশু ৫৪ থাকে ২৫ সঠিকভাবে বিয়োগ করতে পারে না; ভারতে গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শতকরা ৭২ জন শিক্ষার্থী দুই অঙ্কের বিয়োগ করতে পারে না; নিকারাগুয়ার তৃতীয় শ্রেণির অর্ধেক শিশু ৬ + ৫ এর সমাধান সঠিকভাবে করতে পারে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন থেকেও দেশে গভীর শিখন সংকটের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পাঁচ.

শিক্ষানীতিতে আট বছর মেয়াদি যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তাকে প্রাথমিক শিক্ষা না বলে প্রতিটি শিশুর জন্য আবশ্যিক মৌলিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই মৌলিক শিক্ষা সব শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক ও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিশ্চিত করা প্রয়োজন যেন প্রতিটি শিশু স্কুলে গিয়ে যেন শেখে। ভারতেও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মৌলিক বা এলিমেন্টারি শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এই মৌলিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে মৌলিক শিক্ষা শেষ করে একজন শিশু চাইলে সাধারণ ধারার শিক্ষায় যেতে পারে আবার কর্মক্ষেত্রের জন্য দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

সুকুমার রায়ের কবিতার এক রাজা ইটের পাঁজার ওপর বসে ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা ‘খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না’। গরিব দেশের শিশুদের অবস্থাও সেই রাজার মতো, তারা স্কুলে গিয়ে ‘পড়ছে কিন্তু শিখছে না’। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথানুসন্ধান আর সব শিশুকে অন্তত আট বছরের কার্যকর মৌলিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার আয়োজন করা এই মুহূর্তে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ নিয়ে ভাবার চেয়ে অনেক জরুরি বিষয়।

*চৌধুরী মুফাদ আহমদ: প্রাবন্ধিক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব।*